ইউনিট ৮

আদর্শ জীবনচরিত

ভূমিকা

যে-সকল মানুষের জীবনাচরণ পদ্ধতি, সাধিত কাজ ও তাঁদের জীবন-দর্শন অন্য মানুষের জীবনাচরণ প্রক্রিয়া ও দর্শনকে প্রভাবিত করে এবং তাদেরকে মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগায়, সে-সকল মানুষের জীবনই আদর্শ জীবন হিসাবে পরিচিত হয়। এই সব আদর্শ জীবনচরিতের সাথে পরিচিত হয়ে সাধারণ মানুষ বুঝতে শেখে যে, শুধু খেয়ে-পরে আরাম-আয়েসে বেঁচে থাকাটাই প্রধান কথা নয়। মানুষের জীবনে বড় লক্ষ্য থাকা চাই এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে তাঁকে নিষ্ঠাবান হতে হয়। প্রয়োজনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। মানুষ এও অনুভব করতে পারে যে. শুধু আত্মকর্ম করার মধ্যে কোন তৃপ্তি নেই। এতে কোনও গৌরবও নেই। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল মানুষের জন্য কাজ করতে পারলেই জীবনে সার্থকতা আসে। আদর্শ মহৎ জীবন মানুষকে সংকীর্ণতা-ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করে। জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণলাভে মানুষকে প্রয়াসী হতে প্রেরণা দান করে।

এই ইউনিটে চারটি পাঠে সংক্ষেপে চারজন আদর্শ মহাপুরুষের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথম পাঠে আলোচিত হবেন শ্রীকৃষ্ণ, ২য় পাঠে শ্রীচৈতন্য, তৃতীয় পাঠে শ্রীরামকৃষ্ণ ও চতুর্থ পাঠে স্বামী বিবেকানন্দ।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট চারটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৮.১: শ্রীকৃষ্ণ

পাঠ- ৮.২: শ্রীচৈতন্য

পাঠ- ৮.৩: শ্রীরামকৃষ্ণ

পাঠ- ৮.৪: স্বামী বিবেকানন্দ

পাঠ ৮.১

শ্রীকৃষ্ণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী বলতে পারবেন।
- শ্রীকৃষ্ণের কর্ম ও সাধনার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ বর্ণনা করতে ও বাণীগুলো বলতে পারবেন।

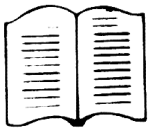

শ্রীকৃষ্ণ

দ্বাপর যুগে মথুরায় রাজা কংসের বোন দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। পিতার নাম বসুদেব। শ্রীকৃষ্ণের মামা অত্যাচারী রাজা কংস দৈববানী শুনতে পেয়েছিলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে। এ জন্যে রাজা কংস শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কিছুকাল আগে থেকেই জেঠতুতো বোন দেবকীকে বসুদেবসহ কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন। কারার অন্তরালেই শিশু কৃষ্ণের জন্ম হয়। দিনটি ছিল ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথি। দৈবাদেশে পিতা বসুদেব কারাগার থেকে শিশুপুত্রকে তুলে নিয়ে গোকুলের নন্দরাজের স্ত্রী যশোদার পাশে রাখেন এবং যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে এনে দেবকীর পাশে রাখেন। পরদিন কংস এই কন্যাকে বধ করেন। এই কন্যাও দৈববাণীর মতো কংসকে জানিয়ে দিয়ে গেল 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'। এই বাণী শুনে কংস ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কংস মথুরার সমস্ত শিশু হত্যার নির্দেশ দিলেন। পুতনা স্তনে বিষ মেখে অনেক শিশুকে হত্যা করে। শ্রীকৃষ্ণ পুতনার স্তনে এমন কঠোরভাবে পান করেন যে, যন্ত্রণায় সে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে। কংস নিশ্চিত হলেন, কৃষ্ণই তার মৃত্যুর কারণ হবেন।

চিত্র ১১: শ্রীকৃষ্ণ

নন্দরাজ কংসের অত্যাচারের ভয়ে কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবন যান। শ্রীকৃষ্ণ বড় হতে থাকলে কংসের ভয় বাড়ে। তিনি অক্রূরকে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান। বালক কৃষ্ণ ও ভাই বলরাম কংসের সভায় উপস্থিত হয়ে বড় বড় যোদ্ধাদের নিধন করে মামা কংসকেও হত্যা করেন। কংসের সিংহাসনচ্যুত পিতা উগ্রসেনকে আবার মথুরার রাজা করে দুই ভাই মা বাবার কাছে থেকে যান। কংসের মৃত্যুতে কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে হত্যার উদ্দেশ্যে আঠার বার মথুরা আক্রমণ করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে দিয়ে তাকে বধ করান। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শন করলে কৃষ্ণবিরোধী চেদিরাজ শিশুপাল রেগে কৃষ্ণ বিষয়ে গালমন্দ করতে থাকেন। এর আগে শ্রীকৃষ্ণ তাকে এ ধরনের কাজের জন্য বহুবার ক্ষমা করেন। এবার তিনি চক্রদ্বারা শিশুপালের মাথা কেটে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। কংস, জরাজন্দ ও শিশুপালের মতো অত্যাচারী রাজাদের বিনাশ ঘটলেও তখনও বেশ কিছু লোভী অত্যাচারী রাজা থেকে যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র ও তার শতপুত্র। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ড দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তাই ছোট ভাই পাণ্ডু রাজা হন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর রাজ্য দুভাগ হল। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুশাসন প্রভৃতি পুত্রেরা অর্ধেক রাজ্য পেয়েও সুখী নয়। গোটা রাজ্য চাই। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির ভীম ইত্যাদি পঞ্চ পাণ্ডবকে হারিয়ে ওরা তাদেরকে বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাত বাসে যেতে বাধ্য করে। ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ পাশা খেলার শর্তানুযায়ী বনে গমন করেন।

বনবাস শেষে পাণ্ডবেরা রাজ্য ফেরৎ চাইলে যুর্যোধনরা তা ফিরিয়ে দেবেনা জানান। পাণ্ডবেরা আত্মীয় শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ চান। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে দুর্যোধনের কাছে যান। দুর্যোধন কঠোর মনোভাব দেখালে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। দুর্যোধনরা সবংশে নিধন হয়। যুধিষ্ঠির রাজ্য ফিরে পেয়ে ধর্মের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেন। উল্লেখ্য যে, যুদ্ধ শুরুর পূর্বক্ষণে অর্জুন তাঁর রথের সারথি বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে তিনি যুদ্ধ করবেন না। কারণ এতে আত্মীয়-স্বজন, বহু লোকজনের জীবন নাশ হবে। এতে দেশ ও সমাজের অকল্যাণ হবে। এটি হবে অধর্মাচরণ। তখন শ্রীকৃষ্ণ যে সকল বাণী দেন তা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আঠারটি অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে। তাঁর মূল বাণী হল মানুষ নিমিত্ত মাত্র। মানুষকে কর্ম করে যেতে হবে। কর্ম করতে হবে নিরাসক্তভাবে, ফলের আকাঙ্খক্ষা না করেই। যুদ্ধও একটি কর্ম। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসা সহজ। ঈশ্বরকে জ্ঞান ও ভক্তির মাধ্যমেও লাভ করা যায়। তবে তা একটু কঠিন। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। জ্ঞান থেকে ভক্তির সৃস্টি হয়। জ্ঞান ও ভক্তি সহযোগে সাধক পরম ব্রহ্মের সাথে মিলিত হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন। একদিন অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় বসে থাকা অবস্থায় তাঁর চরণ শরবিদ্ধ হয়। বিষাক্ত শর ছুঁড়েছিল জরা নামের ব্যাধ। জরা হরিণ ভেবেই তীর ছুঁড়েছিল। তীরের আঘাতে আহত শ্রীকৃষ্ণ তখনই ইহলীলা সংবরণ করেন।

ভগবান দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্ম রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সকল মহৎ কর্ম সাধন করেছেন তা ঈশ্বরের লীলা। তাই ভক্তেরা তাঁকে স্বয়ং ভগবান বলে থাকেন।

সারাংশ

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে মথুরায় দেবকীয় গর্ভে জন্ম নেন। তাঁর পিতার নাম বসুদেব। কিন্তু তিনি লালিত হন গোকুলের যশোদার ঘরে। অত্যাচারী মামা কংসের ভয়ে পিতা বসুদেব তাঁকে যশোদার পাশে রেখে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাল্য বয়সেই একে একে অত্যাচারী রাজা কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল ইত্যাদি রাজার বিনাশ সাধন করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে তিনি ধর্ম রক্ষার এক মহান আদর্শ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সংকলিত সুমহান বাণী উপহার দিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শ্রীকৃষ্ণে জন্ম হয় কোন তিথিতে?
- ক. শ্রাবনের শুক্লা পঞ্চমী
- খ. ভাদ্রের শুক্লা পঞ্চমী
- গ. ভাদ্রের কৃষ্ণা অষ্টমী
- ঘ. আশ্বিনের কৃষ্ণা দশমী।

২। কে জরাসন্ধকে বধ করেন?
- ক. শ্রীকৃষ্ণ
- খ. বলরাম
- গ. ভীমসেন
- ঘ. বসুদেব।

৩। শ্রীকৃষ্ণের চরণে কে তীর বিদ্ধ করেছিল?
- ক. জরা
- খ. বীরা
- গ. গ্যধরা
- ঘ. ধীরা।

৪। শ্রীকৃষ্ণের জন্দাত্রী মাতার নাম কি?
- ক. দেবকী
- খ. যশোদা
- গ. লীলা
- ঘ. দুর্গা।

৫। শ্রীকৃষ্ণের মামার নাম কি?
- ক. জরাসন্ধ
- খ. কংস
- গ. শিশুপাল
- ঘ. অর্জুন।

পাঠ ৮.২ শ্রীচৈতন্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রীচৈতন্যের জীবন কাহিনী বলতে পারবেন।
- শ্রীচৈতন্যের কর্ম ও সাধনার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- শ্রীচৈতন্যের আদর্শ ও বাণী সম্পর্কে বলতে পারবেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক বাড়ী ছিল তৎকালীন শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ গ্রামে। বর্তমানে তা বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট জেলায় অবস্থিত। জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন শান্ত স্বভাবের ধার্মিক ব্যক্তি। শচীদেবীও ছিলেন ভক্তিমর্তী। মা ও বাবা চৈতন্যদেবের নাম রেখেছিলেন নিমাই। নিমাইয়ের দশ এগার বছর বয়সে জগন্নাথ মিশ্র প্রয়াত হন।

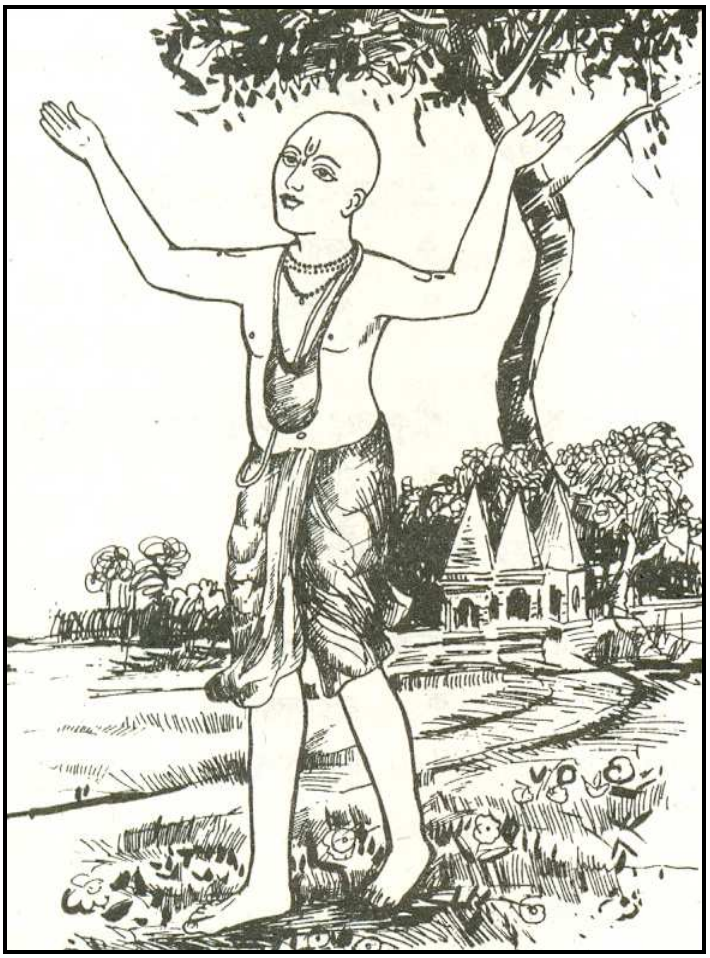

চিত্র ১২: শ্রী চৈতন্য।

বালক নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পড়াশোনা করেন। তিনি অসাধারণ রূপবান ও মেধাবী ছিলেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন খুবই চঞ্চল মতির। বাল্যবয়সে তাঁর অতুলনীয় মেধা সবাইকে বিস্মিত করেছিল। তিনি স্বল্পকালের মধ্যেই ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র। সমৃতিশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ষোল বছর বয়সেই সারাদেশে তিনি পণ্ডিত নিমাই নামে সমাদৃত হন। তিনি এই বয়সেই টোল খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। সহসা তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় বিনা পণে তিনি লক্ষ্মীদেবীকে বিয়ে করেন।

পণ্ডিত নিমাইয়ের খ্যাতি খর্ব করার জন্য কাস্মীরের প্রথিতযশা পণ্ডিত কেশব মিশ্র নবদ্বীপে আসেন। এর আগে তিনি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, নালন্দা প্রভৃত স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করেন। নিমাই পণ্ডিত কেশব মিশ্রকে অনায়াসে পরাজিত করেন। এতে নিমাইয়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আরও বেড়ে যায়।

কিছুদিন পর নিমাই বর্তমান বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর শর্পদংশনে মৃত্যু হয়। এতে তাঁর মধ্যে সংসার ধর্মের প্রতি বিরাগ প্রবল হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে তিনি ধর্মের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠেন। সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য শচীদেবী নিমাইকে সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে বিয়ে দেন।

কয়েক বছর পর নিমাই পরলোকগত পিতার আত্মার সদ্‌গতির জন্য পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়ায় যান। সেখানে তিনি ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা লাভ করেন। এই দীক্ষা নিমাইয়ের মনে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত করে। তিনি আর সংসারে আকর্ষণ বোধ করেন না। অধ্যাপনায়ও তাঁর উৎসাহ নেই। তিনি হলেন কৃষ্ণভক্ত এক মহাসাধক । নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা তাঁর সান্নিধ্যে আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে মাতোয়ারা হয়ে উঠেন। শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ ছিলেন নিমাইয়ের পার্ষদ।

একদিন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নিত্যানন্দের সাথে পরিচয় হয়। তিনি নিমাইয়ের ভক্তে পরিণত হন। পরবর্তীকালে নিত্যানন্দই ছিলেন নিমাইয়ের প্রধান পর্ষদ। এ সময় সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্রদেব মধ্যে বর্ণবৈষম্য প্রথা চালু ছিল। ব্রাহ্মণেরা ছিল সমাজের শাসক। সমাজে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা, সহানুভূতি ছিলো না। উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের ঘৃণার চোখে দেখত। নিমাই মুচি, মেথরসহ নিম্নবর্ণের সবাইকে বুকে টেনে নিলেন। উচ্চ ও নিম্নবর্ণের ভেদাভেদ দিলেন ঘুচিয়ে। নিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভৃতি পার্ষদের মাধ্যমে তিনি প্রেমভক্তির বৈষ্ণবধর্ম প্রচার শুরু করেন। তাঁকে অনেকের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ক্রমে সবাই তাঁর প্রেমভক্তির ধর্মের প্রতি অনুরাগী ও প্রদ্ধালীন হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর নিমাই কিছুদিন ধরে সংসার ত্যাগের কথা ভাবছেন। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে তিনি মা ও স্ত্রীকে ছেড়ে গভীর রাতে গৃহত্যাগ করেন। কাটোয়ায় এসে তিনি কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন। নবীন সন্ন্যাসীর নামকরণ করা হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য।

এরপর শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে যেতে চাইলেন। যাওয়ার পথে ভক্তদের অনুরোধে তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়ি আসেন। সেখানে মা শচবীদেবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মায়ের অনুরোধে নিনি নীলাচলে থেকে মায়ের খবর রাখায় সম্মত হন। মাতৃভক্ত চৈতন্যদেব জীবনের শেষাবাধি মায়ের খোঁজখবর নিয়েছেন।

চৈত্যাদেব জীবনের শেষ আঠার বছর কাটিয়েছিলেন উড়িষ্যার নীলাচলে। এর আগে তাঁর ধর্মদর্শন প্রচারে তিনি পুরী, দক্ষিণাত্য ও বৃন্দাবনে যান। সেখানে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সাথে মতামত বিনিময় করেন।

১৫৩৩ সালের আষাঢ় মাসে একদিন চৈতন্যদেব দিব্যভাবে আবিষ্ট পয়ে প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। হঠাৎ মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দরজা খোলা হলে চৈতন্যদেবকে আর দেখা যায় না।

চৈতন্যদেবের কয়েকটি বাণী:
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥

সারাংশ

১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ণিমা তিথিতে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব জম্মগ্রহণ করেন। পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচিদেবী। মা-বাবা তাঁর নাম রেখেছিলেন নিমাই। নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়াশোনা করেন, ষোল বছার বয়সে তিনি টোল খুলে অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করেন। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে তিনি সংসার ত্যাগ করে কাটোয়ার যান এবং কেশবভারতীয় তার নুতন নামকরণ করেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বা সংক্ষেপে চৈতন্যদেব। তিনি প্রেমভক্তির বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন এবং বর্ণবৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক নিবাস কোথায় ছিল?
ক. কাশী খ. বৃহত্তর সিলেট জেলা
গ. বৃন্দবন ঘ. কামার পুকুর।

২। নিমাই গয়ায় কার কাছে দীক্ষা পান?
ক. তোতাপুরী খ. ঈশ্বরপুরী
গ. কেশব মিশ্র ঘ. চন্দ্রপুরী।

৩। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য কে ছিলেন?
ক. নিত্যানন্দ খ. মুকুন্দ
গ. গদাধর ঘ. জগাই।

৪। শ্রীচৈতন্যদেবের পিতার নাম কি?
ক. পণ্ডিত কেশব মিশ্র খ. পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র
গ. শ্রীবাস পণ্ডিত ঘ. পণ্ডিত বিশ্বনাথ মিশ্র।

পাঠ ৮.৩ শ্রীরামকৃষ্ণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কাহিনী বলতে পারবেন।
- শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবন বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণী সম্পর্কে বলতে পারবেন।

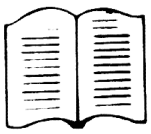

শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জেলায় কামার পুকুর গ্রামে ১৮৩৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। মাতা চন্দ্রমণি দেবী। গয়াধাম তীর্থ ভ্রমণকালে তীর্থদেবতা গদাধর ক্ষুদিরামকে স্বপ্নে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর ঘরে আসছেন। স্বপ্নকথা স্মরণ করে শিশুর নাম রাখা হয় গদাধর।

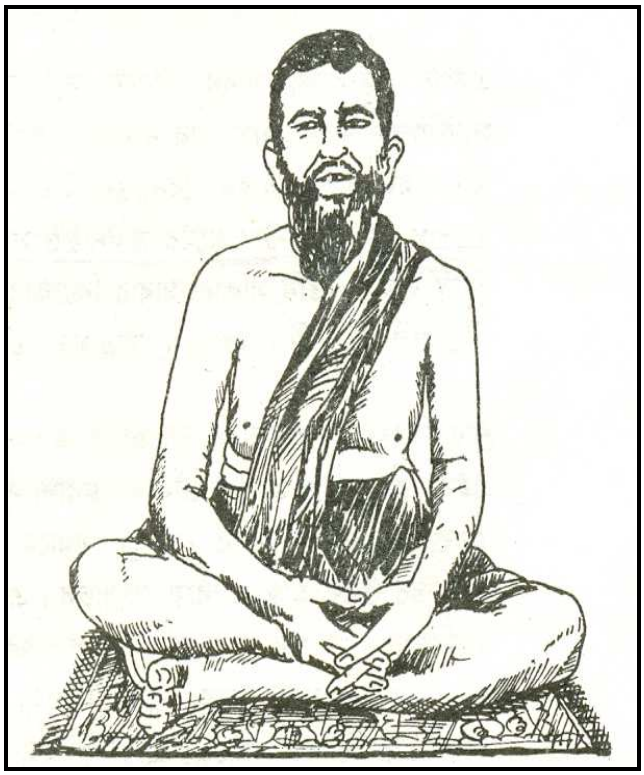

চিত্র ১৩: শ্রীরাম কৃষ্ণ।

সুদর্শন বালক গদাধরের মুখমণ্ডলে সবসময় প্রসন্নভাব দেখা যেত। বালকটি ছিলেন প্রকৃতি প্রেমী। প্রকৃতির নানা দৃশ্য দেখে তিনি বিমোহিত হতেন। ভজন-কীর্তনে তাঁর ছিল প্রবল আকর্ষণ। ঠাকুর-দেবতার কথা ভাবতে গিয়ে ভাবে ও আবেশে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। লোকমুখে শুনে শুনে বালক গদাধর বহু স্তব স্তোত্র, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী মুখস্ত করে ফেলেন। কিন্তু স্কুলের লেখাপড়ায় তাঁর মন বসতো না একেবারেই।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। শ্মশানে বা নির্জনে বসে কি যেন ভাবেন। কখনও সাধু-বৈষ্ণবদের সঙ্গ করে তাঁদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করতেন। তাঁদের কাছ থেকে ভজন শিখতেন। বড়ভাই রামকুমার গদাধরকে নিয়ে জীবিকার সন্ধানে কলিকাতা আসেন। এ সময় রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামকুমার কালী মন্দিরের পুরোহিতের চাকুরীতে নিযুক্ত হন। গদাধর এখানেও মায়ের মন্দিরে বা নির্জন গঙ্গাতীরে ভাবে তন্ময় হয়ে থাকতেন। রামকুমারে মৃত্যুর পর মন্দিরের পৌরাহিত্যের ভার দেওয়া হয় গদাধরকে।

গদাধর মা ভবতারিণীর পূজায় দেহমন সমর্পণ করেন। সব সময় ব্যাকুল হয়ে মাকে ডাকতেই থাকেন। একদিন মা তাঁকে দর্শন দান করেন। গদাধরের জীবনে আরও পরিবর্তন ঘটে যায়। দিব্যভাবের আবেশ হতে থাকে ঘন ঘন। এ সংবাদে বিচলিত হয় মা চন্দ্রমণি তাঁকে কামার পুকুরে ফিরিয়ে এনে সারদামণির সাথে বিয়ে দেন।

বিয়ের অল্পদিনপর গদাধর আবার দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ফিরে আসেন। ১৮৬১ সালের শেষে সিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন। গদাধর ভৈরবীকে গুরুপদে বরণ করে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ভৈরবী গদাধরকে অসাধারণ যোগী ও অবতার পুরুষ বলে গণ্য করেন।

এরপর গদাধরের সাধন জীবনে সন্ন্যাসী তোতাপুরীর আগমন ঘটে। গদাধরকে তিনি সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নামকরণ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তোতাপুরীর সহায়তায় শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্ত্রিক ইত্যাদি সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এছাড়া তিনি ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্মের সাধনায়ও সফলতা লাভ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন ঈশ্বরের অনন্ত লীলা। তিনি সাকার আবার নিরাকারও। সব পথ ও মতে সাধনা করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তিনি বললেন, ‘যত মত, তত পথ’।

শ্রীরামকৃষ্ণের উত্থানকালে ভারতবর্ষে এক যুগসংকট দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকের অধীন এই উপমহাদেশে জাতীয় জীবনে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। এদেশে ইংরেজি শিক্ষিত নব যুব সমাজে তার প্রভাব পড়েছিল বেশি। তাঁরা দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছিল। এ দেশের রক্ষণশীল সমাজেও চলছিল নানা ধরনের মতবিরোধ। এ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ লোকগুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দলে দলে লোক তাঁর কাছে ছুটে আসতে থাকে জীবন, জগৎ, ধর্ম ও মানবতা সম্বন্ধে উপদেশ শোনার জন্য। কলকাতার শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি মনীষী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশ ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর, নরেন্দ্রনাধ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তি তাঁর কাছে আসেন। নরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যে পরিণত হন। নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস জীবনে নামকরণ করা হয় স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই যুগ-সংকটে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। তিনি পরাধীন ভারতের মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাসে ভর করে আত্মশক্তি জাগরণের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। জাতিভেদে প্রথার ক্ষতিকর দিক চিহ্নিত করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ সালের ১৬ আগষ্ট সমাধিতে নিমগ্ন হন। সেই সমাধি থেকে তিনি আর নশ্বর দেহে ফিরে না এসে ক্রমে অমৃতধামে যাত্রা করেন।

সারাংশ

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলায় কামার পুকুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম পথে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ে 'যত মত, তত পথের' কথা বলেন। ১৮৮৬ সালের ১৬ আগষ্ট তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম রাখা হয়েছিল-
- ক. গোপাল
- খ. গদাধর
- গ. গোবিন্দ
- ঘ. গোকুল।

২। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-
- ক. রাসমণি
- খ. কেশবন্দ্র
- গ. সারদামণি
- ঘ. যোগেশ্বরী।

৩। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য-
- ক. অভেদানন্দ
- খ. বিবেকানন্দ
- গ. গিরিশ
- ঘ. বিদ্যাসাগর।

৪। 'যত মত, তত পথ'- কথাটি কে বলেছিলেন?
- ক. বিবেকানন্দ
- খ. স্বরূপানন্দ
- গ. শ্রীরামকৃষ্ণ
- ঘ. বিজয়কৃষ্ণ।

পাঠ ৮.৪ স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিবেকানন্দের জীবন কাহিনী বলতে পারবেন।
- বিবেকানন্দের সাধন জীবন বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিবেকানন্দের আদর্শ ও বাণী সম্পর্কে বলতে পারবেন।

কলিকাতায় শিমুলিয়ায় ১৮৬৩ সালের ১০ জানুয়ারি বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। পিতা ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর আরও একটি নাম ছিল। তা হল বীরেশ্বর। কিন্তু সবাই ডাকতো 'বিলে' বলে।

চিত্র ১৪: স্বামী বিবেকানন্দ।

বিলে ছোটকালে ছিলেন দুরন্ত। বড় একরোখা। যা ধরবেন তা শেষ করে ছাড়বেনই। দুরন্ত হলেও পড়াশোনায় ছিলেন মনোযোগী। শিক্ষক পড়ে গেলেই তা তার মুখস্ত হয়ে যেত। রামায়ণ-মহাভারতের কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। প্রায়ই আসনে বসে 'ধ্যান-ধ্যান' খেলতেন। বালক বয়সেই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নির্ভীক। ১৮৭৯ সালে নরেন প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮১ সালে এফ, এ, এবং ১৮৮৪ সালে তিনি বি, এ, পরীক্ষা পাশ করেন। এ সময় ধর্ম ও ঈশ্বর কি তা জানার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেন। পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে পরিচয় ঘটলে তিনি তাঁর কাছে ছুটে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের রানী রাাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের পুরোহিত ও পরম সাধক। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে নরেন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শন প্রভাবিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর মনের দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। নরেন শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর প্রধান শিষ্য হিসাবে গণ্য হন। ঠাকুর বললেন, 'নরেন লোকশিক্ষা দিবে'। নরেন সমাধিতে ডুবে থাকার বাসনা প্রকাশ করলে ঠাকুর তাঁকে তিরস্কার করেন। তিনি বললেন, 'তোর ছায়ায় হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস।' শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের সন্ন্যাস জীবনের নামকরণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি স্বামীজী রূপেই বিশেষ পরিচিত। ঠাকুরের নির্দেশে তিনি তাঁর কর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে পথ ঠিক করে নেন।

বিবেকানন্দ নিজের চোখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান দেখার জন্য বেরিয়ে পড়েন। সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন। সকল সম্প্রদায়ের লোক এবং ধনী ও দরিদ্রের সাথে মিশলেন। তিনি সারা দেশে দারিদ্র্য দেখলেন। দেখলেন অশিক্ষা, কুশিক্ষা। এ সকল মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে হবে। মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। দেশের মানুষের এই অবস্থার কথা বহির্বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে।

বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে আমেবিকার শিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেন। সেখানে তিনি ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে অতুলনীয় ভাষণ দান করেন। তিনি উদাত্তকণ্ঠে সবাইকে আহবান জালালেন, যুদ্ধ নয়, ধ্বংস নয়, শান্তি চাই। দারিদ্র্য মুক্ত বিশ্ব, শান্তিময় বিশ্ব সৃজনে তিনি সবার কাছে আবেদন জানান। ধর্ম সম্মেলনে তিনি শ্রেষ্ঠ বক্তা বিবেচিত হন। এরপর তিনি লন্ডন, ফ্রান্স, ইটালি সহ বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এর মধ্যে মার্গারেট নোবল বিখ্যাত। স্বামীজির দীক্ষিত এই নারী পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

পৃথিবী জয় করে বিবেকানন্দ দেশে ফিরলেন এবং স্বদেশের সেবায় নিজেকে সর্ম্পণ করলেন। তিনি বললেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সমস্ত কুসংস্কার ধ্বংস করতে হবে। সব মানুষকে এক হতে হবে। শক্তি ও সাহসই হল ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। মুনুষের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। সেবার আদর্শ নিয়ে তিনি বেলূড়ে প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

কর্মবীর, অকৃতদার সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের কল্যাণেই সবটুকু সময় ব্যয় করে গেছেন। কাজ করতে করতে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই বেলূড় মঠেই এই মহামানবের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বাণী:

- পরোপকারই ধর্ম। পরপীড়নই পাপ।
- ভুলো না- নিচু জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।
- সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি।
- সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা- এই দুয়ের মধ্যেই সমগ্র ধর্ম।

সারাংশ

স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতার শিমুলিয়ায় ১৮৬৩ সালের ১০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বি, এ, পাশ করার পর তাঁর মধ্যে ধর্ম ও ঈশ্বরের বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরাধীন ভারতের মানুষের অবস্থা জানানোর জন্য আমেরিকার শিকাগোয় অনুষ্ঠিত ধর্মসম্মেলনে যোগ দেন। এরপর বহু দেশ ভ্রমণ করেন। দেশে ফিরে মানুষের সেবায় আত্মনিবেদন করেন। সেবার আদর্শ সামনে রেখে তিনি বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠেই ১৯০৪ সালের ৪ জুলাই দেহত্যাগ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। স্বামী বিবেকানন্দের জন-
- ক. ১৮৬৩ সালে
- খ. ১৮৬০ সালে
- গ. ১৯৬৫ সালে
- ঘ. ১৯৬৮ সালে।

২। স্বামী বিবেকানন্দের পিতার নাম-
- ক. বিশ্বনাথ
- খ. জগন্নাথ
- গ. বিশ্বজিৎ
- ঘ. বীরেশ্বর।

৩। স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসপূর্ব নাম-
- ক. বীরেন্দ্র
- খ. শৈলেন্দ্র
- গ. নরেন্দ্র
- ঘ. সুরেন্দ্র।

৪। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্মসভায় যোগ দেন কোন সালে?
- ক. ১৮৬৩
- খ. ১৮৭৩
- গ. ১৮৮৩
- ঘ. ১৮৯৩।

৫। স্বামী বিবেকানন্দ কোন সাধনার উপর বেশি জোর দেন?
- ক. জ্ঞান
- খ. ভক্তি
- গ. কর্ম
- ঘ. সেবা।

আ) রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী সংক্ষেপে বলুন। (পাঠ- ১ দেখুন)
২. শ্রীচৈতন্যের কর্ম ও সাধনার বর্ণনা দিন। (পাঠ- ২ দেখুন)
৩. শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। (পাঠ- ৩ দেখুন)
৪. স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। (পাঠ- ৪ দেখুন)

ই) সংক্ষেপে উত্তর দিনঃ

ক. শ্রীকৃষ্ণ কোথায় এবং কোন তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন?
খ. শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে ইহলীলা ত্যাগ করেন?
গ. শ্রীচৈতন্য কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ঘ. শ্রীচৈতন্যের পিতা ও মাতার নাম কি?
ঙ. লক্ষ্মী দেবীর কিভাবে মৃত্যু হয়?
চ. শ্রী রামকৃষ্ণ কোথায় এবং কখন জন্মগ্রহণ করেন?
ছ. ছোট বেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন ছিলেন?
জ. বাবার মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণ কি করতেন?
ঝ. কে গদাধরকে সন্যাসী মন্ত্রে দীক্ষা দেন?
ঞ. নরেন কার কাছ থেকে দীক্ষা লাভ করেন?
ট. স্বামী বিবেকানন্দ কত সালে শিকাগো যান?
ঠ. শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ কি বিষয়ে ভাষণ দেন?
ড. কোথায় এবং কতসালে স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটে?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৮.১
১. গ; ২. গ; ৩. ক; ৪. ক; ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৮.২
১. খ; ২. গ; ৩. ক; ৪. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৮.৩
১. খ; ২. ক; ৩. খ; ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৮.৪
১. ক; ২. ক; ৩. গ; ৪. ঘ; ৫. ঘ